তথ্যপ্রযুক্তির আজকাল

মোস্তাফা জব্বার

এক বছর হলো দেশের সফটওয়্যার ও সেবা খাতের একমাত্র বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) সভাপতির দায়িত্ব পার করলাম। ১৫ জুলাই ছিল এর বর্ষপূর্তি। আমার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কোনো বাণিজ্য সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব নেয়া একদমই নতুন নয়। সেই '৯২ সালে প্রথম বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সাথে যুক্ত হই। প্রথমে সাধারণ নির্বাহী সদস্য ও পরে কোষাধ্যক্ষ্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর '৯৬ সালে প্রথম সেই সমিতির সভাপতি হই। সেই সময়ে '৯৭ সাল পর্যন্ত সভাপতি ছিলাম। একনাগাড়ে ছয় বছর ছিলাম বলে সেবার প্রার্থী হতে পারিনি। এরপর লম্বা বিরতি দিয়ে ২০০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২ ধারাবাহিকভাবে ও এক বছর বিরতির পর এপ্রিল '১৩-মার্চ '১৪ সময়কালে আবার সেই সমিতির সভাপতি ছিলাম। ২০০৩-০৪ সালে একই সাথে বেসিস-বিসিএসের পরিচালক ছিলাম। বিসিএস সভাপতি হিসেবে সেই সময়ে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম, তাতে প্রচুর চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ সফলতার সাথে মোকাবেলা করি। '৯৭ সালে জেআরসি কমিটির রিপোর্ট পেশ, ৪৫টি সুপারিশ প্রদান ও ২৮টি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এই শিল্প তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। '৯৮-৯৯ সালে কমপিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের পর এই শিল্প অসাধারণ গতিতে সামনে পা বাড়ায়। তখনই কপিরাইট আইন, তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা ইত্যাদির সাথে যুক্ত হই। বেসিস গঠিত হয় জেআরসি কমিটির সুপারিশ অনুসারে '৯৭ সালে। ঘটনাচক্রে এই ঘটনাগুলোর আবর্তনের কেন্দ্রে ছিলাম আমি। ২০০১ থেকে ২০০৮ সময়কালটা তথ্যপ্রযুক্তির জন্য প্রচণ্ড মন্দায় গেলেও বেসরকারি খাত তাকেও দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেছে। ২০০৮ সালে স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে তথ্যপ্রযুক্তিকে একটি বিষয় হিসেবে পাঠ্য করার জন্য সুপারিশ করার কাজটি কঠোর হলেও সেটির সূচনা করা সম্ভব হয়, যা ২০১১ সাল থেকে বাস্তবায়িত হতে থাকে। ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করার পর '০৯ সালে শেখ হাসিনার সরকার এই খাতকে সর্বাত্মক সহায়তা করেছে। যেহেতু এই সময়েও বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সাথে প্রায় ৬ বছর যুক্ত ছিলাম, সেহেতু সরকারের সর্বাত্মক সহায়তার বিষয়টি আমার নজরে পড়েছে। বস্তুত '১৭ সালের বাংলাদেশ ডিজিটাল রূপান্তরের অসাধারণ অগ্রগতির দেশ।

মজার বিষয়, এক বছর আগে বেসিসের সভাপতি হওয়ার পর অনুভব করলাম, সময়টি আগের মতো নেই। বিসিএসের কাজ ছিল কম দামে দেশে কমপিউটার আনা ও জনগণকে কমপিউটারের বিষয়ে সচেতন করা। বেসিসের পরিধিটা একেবারেই ভিন্ন। এমনকি জন্মের সময় আমরা যে বেসিসকে যে কাজের জন্য গড়ে তুলব বলে মনে করেছিলাম, এখন আর সেই অবস্থাটি বিরাজ করে না।

বেসিসের জন্মের সময় ১৯৯৮-৯৯ সালে সহ-সভাপতি এবং ২০০৩-০৪ সালে পরিচালক থাকার পর এবার ২০১৬ সালের ১৫ জুলাই থেকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের একটি নতুন চিত্র দেখতে পাচ্ছি। ১৪ জুলাই '১৭ পর্যন্ত এই কমিটির এক-তৃতীয়াংশের মেয়াদ থাকার কথা ছিল। তবে ডিটিওর নির্দেশনা অনুসারে নির্বাহী কমিটির মেয়াদ দুই বছর করার ফলে এই মেয়াদ ৫ মাস বাড়তে পারে বা এক বছর বাড়তে পারে এবং সর্বোচ্চ ২০১৮ সালের ১৪ জুলাই শেষ হতে পারে। হিসেব করলে তথ্যপ্রযুক্তির বাণিজ্য সংগঠনের এই পথচলা ছোট বা সংক্ষিপ্ত নয়। নিজেকে যদি এই কথাটি বলে বোঝাতে চাই, কেমন মনে হচ্ছে নতুন দায়িত্ব পেয়ে, তবে এটি মনে হতেই পারে যে, চ্যালেঞ্জটি মোটেই কম নয়। সেই '৮৭ সালে এই জগতে প্রবেশ করে শুধু স্রোতের বিপক্ষেই চলতে থেকেছি। মানুষ যখন কমপিউটারকে বাইনারি যন্ত্র হিসেবে তুলে ধরেছে, আমি তখন সেটাকে প্রকাশনার যন্ত্র বানিয়েছি-ছবি আঁকার যন্ত্র বানিয়েছি। আমার এসব কাজের খেসারতও আমাকে দিতে হয়েছে। বহু বছর আমি কমপিউটার বিক্রেতার সম্মানও পাইনি। আমাকে বলা হতো মুদ্রণ যন্ত্র বিক্রেতা। তখন থেকেই সফটওয়্যার বানিয়েছি, কিন্তু সফটওয়্যার নির্মাতার মর্যাদা এখনও পাইনি। এখনও এমন ধারণা বিরাজ করে যে, সফটওয়্যার বিক্রি করা একটি মহাঅপরাধ। মেধাজাত সম্পদ তৈরি করাও যেন বিশাল অপরাধ। সবাইকে সব ফ্রি দিতে হবে এবং নিজের মেধাসম্পদ অন্যকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি আমার কপিরাইট ও প্যাটেন্ট করা সফটওয়্যার নিজের দাবি করলে আমাকে কুৎসিতভাবে বিভিন্ন গালি দেয়া হয়। নোংরা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছাড়া হয়। আর আমার মেধাসম্পদ যারা চুরি করে, তারা নায়কে পরিণত হয়। তবুও দেশের প্রথম কমপিউটার মেলা, প্রথম রফতানি টাস্কফোর্স, শুল্ক ও ভ্যাটমুক্ত আন্দোলন, তথ্যপ্রযুক্তিসহ সম্প্রচার-অনলাইন নীতিমালাসমূহ ও কপিরাইট আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বা সম্প্রচার আইনসহ বিভিন্ন আইন প্রণয়নসহ এমন কোনো মুহূর্ত যায়নি যাতে নিজে সরাসরি যুক্ত হইনি। লক্ষ করেছি, এক সময়ে কমপিউটার বিজ্ঞানীরা যখন এটাকে প্রোগ্রামিংয়ের যন্ত্র বানাতে চেয়েছেন, আমি তখন সেটিকে সৃজনশীলতার যন্ত্র বানিয়েছি। এরপর বাণিজ্য সংগঠনের হাত ধরে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে এলাম। বিসিএস ও বেসিস এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফরম হিসেবে কাজে লেগেছে। যদি এসব সংগঠনের জন্ম না হতো, তবে কমপিউটার এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার ল্যাবেই আবদ্ধ থাকত। এখন সেটি দেশের প্রতিটি নাগরিককে স্পর্শ করছে। এমন একটি অবস্থায় মোট ৯ জন পরিচালককে নির্বাচিত করে বেসিস সদস্যরা দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অন্যতম প্রধান এই সংগঠনটির মাধ্যমে শুধু ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কথাই ভাবছে না, ভাবছে '৪১ সালের জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথাও। এই এক বছরে বেসিস নিয়ে যে কাজগুলো আমাকে করতে হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো– ০১. রাষ্ট্রভাষা বাংলায় বেসিসের যাবতীয় যোগাযোগ করা। ০২. জাতির জনক ও সরকার প্রধানকে বেসিসের সম্মানের জায়গায় স্থাপন করা। ০৩. বেসিস শুধু ইভেন্ট ব্যবস্থাপনা করে তেমন একটি ধারণাকে বদলানো। ০৪. বেসিসের নিজস্ব আয়োজন যেমন সফটএক্সপো সফলভাবে সম্পন্ন করা। ০৫. বেসিস সদস্যদেরকে স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে সক্রিয় করা। ২৪টি স্থায়ী কমিটির সহায়তায় সেই কাজটি সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে। ০৬. সরকারের ▸

বেসিসের জন্মের সময় ১৯৯৮-৯৯ সালে সহ-সভাপতি এবং ২০০৩-০৪ সালে পরিচালক থাকার পর এবার ২০১৬ সালের ১৫ জুলাই থেকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের একটি নতুন চিত্র দেখতে পাচ্ছি। ১৪ জুলাই '১৭ পর্যন্ত এই কমিটির এক-তৃতীয়াংশের মেয়াদ থাকার কথা ছিল। তবে ডিটিওর নির্দেশনা অনুসারে নির্বাহী কমিটির মেয়াদ দুই বছর করার ফলে এই মেয়াদ ৫ মাস বাড়তে পারে বা এক বছর বাড়তে পারে এবং সর্বোচ্চ ২০১৮ সালের ১৪ জুলাই শেষ হতে পারে।

সাথে বেসিসের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করে সমাধান করা। এর মাঝে ছিল বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের সমস্যা, কর ও ভ্যাট বিষয়ক সমস্যা এবং নানা খাতে নানা ধরনের সঙ্কটে পতিত সদস্যদেরকে সহায়তা করা। এই সময়ে সরকারের সাথে চলমান কাজগুলো করার পাশাপাশি যেটি সবচেয়ে বড় অর্জন, সেটি হচ্ছে রফতানিতে শতকরা ১০ ভাগ নগদ সহায়তা পাওয়া। ০৭. বেসিসের সংঘবিধি সংশোধন ও সেই আলোকে এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরও সচল করা। ০৮. বেসিসের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে গতিশীল করা ও এর দ্বিতীয় স্তরটিকে আরও সুবিন্যস্ত করা। ০৯. সরকারের আইন ও নীতিসমূহ হালনাগাদ করার পাশাপাশি সরকারি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা। ১০. একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বেসিসের ইনকিউবেটর নামের প্রতিষ্ঠানটি যাকে এসটিপি-১ বলা হয়, তার ৫ কোটি টাকার বকেয়া ভাড়া আদায় করা। সুদসহ এটি ২০১১ সাল থেকে বহমান হয়ে ৯ কোটি অতিক্রম করেছে। ১১. এই এক বছরেই বেসিস সদস্যদের আগের সুবিধাগুলোর সাথে বহুমুখী সুযোগের সদস্য কার্ড, ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড, বিনা জামানতে ব্যাংক ঋণ সুবিধাসহ বেসিস সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়। ১২. এর বাইরে সরকারি-বেসরকারি ইভেন্টগুলোতে অংশ নেয়া, অ্যাপিক্টা, জাপান আইটি উইক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে যুক্ত থাকা ও বেসিসের অংশ নেয়া নিশ্চিত করার বিষয়গুলো ছিল।

অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তিতে আমাদের দেশটিও সামনে চলার পথে নানা স্তরের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। যেভাবে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত সামনের দিকে পা বাড়াচ্ছে, তাতে এখনই মূল্যায়ন করার সময়, এই খাতের চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

সবাই জানেন, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংস্থাটি ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স। এর সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর পূর্বপুরুষকে তিনি তার প্রথম শাসনকালে গড়ে তুলেছিলেন। এই আমলে তার নাম বদলেছে। এই টাস্কফোর্সের একটি সহায়ক কমিটি আছে, এর নাম ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স নির্বাহী কমিটি। এটিও উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। কারণ, এর সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে বিশেষত আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয়ক জটলা ছাড়াতে এর চেয়ে শক্তিশালী সংস্থা আর হতে পারে না। আমরা এই টাস্কফোর্সের সভা চাই। খুব সঙ্গত কারণেই এই গুরুত্বপূর্ণ টাস্কফোর্সের সভায় আমরা তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

৬ আগস্ট ২০১৫ প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরবর্তী সময় ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ এবং ২৭ মার্চ ২০১৭ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো: আবুল কালাম আজাদ ও কামাল আবদুল নাসেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুটি সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে করণীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। উক্ত তিনটি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এতদবিষয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের পরবর্তী সভা আহ্বান করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। উল্লিখিত বিষয়গুলো একাধিক বা ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত হওয়ায় ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের মূল কমিটির সভায় এই বিষয়গুলো আলোচিত হতে পারে। যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হতে পারে, সেগুলো নিম্নরূপ–

> এই সময়ে সরকারের সাথে চলমান কাজগুলো করার পাশাপাশি যেটি সবচেয়ে বড় অর্জন, সেটি হচ্ছে **রফতানিতে শতকরা ১০ ভাগ নগদ সহায়তা পাওয়া**

ক. মেধাস্বত্ব : ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে মেধাস্বত্ব। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মেধাস্বত্বিষয়ক আইনগুলো আপডেট করা নেই। কপিরাইট আইন ২০০০ সালের। এতে ডিজিটাল সম্পদের সুরক্ষার সঠিক উপায় নেই। প্যাটেন্ট আইন ২০১১ সালের। সেটি সফটওয়্যারের চাহিদা মেটাতে পারে না। এজন্য আইন প্রণয়ন ও এর প্রয়োগ জরুরি একটি বিষয়। কিন্তু বিষয়গুলো সেভাবে এগোচ্ছে না। এই বিষয়ে সংস্কৃতি ও শিল্প মন্ত্রণালয় ছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আমরা মেধাস্বত্বে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছি– ০১. কপিরাইট আইন সংশোধন, ০২. প্যাটেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন আইন প্রণয়ন ও ০৩. ডিজিটাল রাইটস বিষয়ক আইন প্রণয়ন বা কপিরাইট আইনে তার অন্তর্ভুক্তিকরণ। ২৭ মার্চের সভায় প্রসঙ্গটি আলোচিত হলেও বহুদিন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অবশেষে ১২ জুলাই ২০১৭ কপিরাইট আইন সংশোধন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরের সপ্তাহে এর দ্বিতীয় সভাটিও অনুষ্ঠিত হয়। তবে তৃতীয় সভাটি বাতিল হয়। এরই মাঝে কপিরাইট অফিস থেকে একটি আপডেটেড খসড়া আমরা হাতে পেয়েছি। এসব ঘটনায় এটি প্রতীয়মান হয়, এবার হয়তো আইনটি সংসদ অভিমুখে যাত্রা করবে। তবে প্যাটেন্ট ও ডিজাইন আইনের কোনো খবর নেই এখনও। সেটি সংশোধন করার কোনো পদক্ষেপ এখনও নেয়া হয়নি। বেসিস এসব ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা রাখছে।

খ. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন : তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বহুল আলোচিত ৫৭ ধারার বিষয়টিকে মাথায় রেখেই ২০১৫ সালে আমরা যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া বানিয়েছিলাম, তা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আশা করছি, আগামী সংসদ অধিবেশনে সেটি হয়তো আইনে পরিণত হবে।

গ. মেধাশ্রম আইন : সম্প্রতি অ্যাকসেঞ্চার নামে একটি বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানি বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর পেছনে প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়নিজম বড় কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। আমরা ২০১৫ সালেই মেধাশ্রমভিত্তিক আইন প্রণয়ন করার জন্য দাবি জানিয়ে আসছি। শ্রম আইনকে সংশোধন করে এই সমস্যাটির সমাধান করা হবে বলে আশা করা যায়।

ঘ. নীতিমালা : আমরা মনে করি, কিছু নীতিমালা বিষয়ক আলোচনা হওয়া জরুরি। বিদ্যমান তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালাকে হালনাগাদ করা ছাড়াও কিছু নতুন নীতিমালা প্রণীত হতে পারে। আমরা তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা আপডেট করার দাবি জানিয়ে আসছিলাম। ২৭ মার্চের সভায় এটি আলোচিত হওয়ার পর তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করি, এটি অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হবে। এ সম্পর্কিত একটি সেমিনার আমাদেরকে আশান্বিত করেছে। ই-কমার্স নীতিমালা প্রণয়ন ছাড়াও এই বিষয়ক জটিলতা নিরসন, ডিজিটাল সার্ভিসেস নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাংলা ভাষার প্রমিতকরণ মানগুলো প্রয়োগ করার বিষয়টি খুবই জরুরি। এই খাতে আলোচ্য বিষয় হতে পারে– ০১. তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা অবিলম্বে নবায়ন, ০২. ই-কমার্সকে ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা হিসেবে প্রণয়ন ও ডিজিটাল কমার্স সংক্রান্ত অন্যান্য জটিলতা নিরসন, ০৩. ডিজিটাল সার্ভিসেস (ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসেস বা VAS) নীতিমালা প্রণয়ন এবং ০৪. ডিজিটাল রূপান্তরের সব পর্যায়ে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও নীতিমালা প্রণয়ন। সরকার তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধকরণ নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এই চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে বলে আশা করি।

ঙ. ইন্টারনেট বিষয়ক : ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল অবকাঠামো ইন্টারনেট। কিন্তু ইন্টারনেট যেমনি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতায় নেই, তেমনি ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইডথ নেই। চ্যালেঞ্জ হলো– ইন্টারনেটের দাম কমানো ও যথেষ্ট গতি নিশ্চিত করা।

চ. শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর : ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর। এজন্য যেমনি ক্লাসরুমগুলো ডিজিটাল করা প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষার্থীদের হাতে ডিজিটাল যন্ত্র দেয়া প্রয়োজন। এর চেয়েও বড় কাজ শিক্ষার কাগজের উপাত্তকে ইন্টারেকটিভ মাল্টিমিডিয়া বা ডিজিটাল কনটেন্টে রূপান্তর করা। এর জন্য একটি পথনকশা থাকতে হবে এবং কাজগুলো সমন্বিত করতে হবে। নির্বাহী কমিটির সভায় সেই নির্দেশনা দেয়া হলেও এখনও তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়ে তোলা, ছাত্রছাত্রীদের হাতে ডিজিটাল যন্ত্র দেয়া ও ডিজিটাল উপাত্ত উন্নয়ন করতে হবে এবং এজন্য পথনকশা তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। জানা মতে, সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডিজিটাল শিক্ষার প্রচলনে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ হাজার ছাত্রছাত্রীকে ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল ল্যাব করছে। শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও ডিজিটাল ক্লাসরুম করছে। কিন্তু এই কাজগুলো সমন্বিত নয়। টাস্কফোর্স নির্বাহী কমিটির সভায় একটি পথনকশা তৈরির কথা বলা হলেও তার কোনো নমুনা দেখতে পাওয়া যায় না।

ছ. দেশীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশ : ২০১৫ সালের ৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সভায় প্রধানমন্ত্রী দেশে ডিজিটাল যন্ত্র বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সেই আলোকে এবারের বাজেটে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার উৎপাদনের ক্ষেত্রে মাইলফলক অগ্রগতি সাধন করব বলে আশা করি।

জ. তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ : দেশে ব্যাপক হারে বিনামূল্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও নতুন প্রকল্পের অধীনে আরও প্রশিক্ষণ হবে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এসব প্রশিক্ষণ সমন্বিত হওয়া উচিত। একেকজন একেক ধরনের প্রশিক্ষণ দিলে তার সুফল জাতি পাবে না। এজন্য একটি সমন্বিত মানবসম্পদ উন্নয়ন পথনকশা তৈরি করা দরকার। বিচ্ছিন্নভাবে মানবসম্পদ তৈরি করা যাবে না, সেটি আমাদেরকে বুঝতে হবে।

ঝ. রফতানি সহায়তা : ২০১৭-১৮ সালে একটি মাইলফলক কাজ করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি রফতানিতে শতকরা ১০ ভাগ রফতানি সহায়তা দেয়া হচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এর ফলে আমরা ১ বিলিয়ন বা ৫ বিলিয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছি, সেটি সময়ের আগেই অতিক্রম করে যাবে। ব্যাংকিং লেনদেন ও কর কাঠামোতে এখনও কিছু জটিলতা রয়ে গেছে। সেইসব জটিলতা দূর করতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে তথা ২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক বলে মনে করি কজ

ফিডব্যাক : *mustafajabbar@gmail.com*

অনলাইনে যেসব কাজের চাহিদা সবচেয়ে বেশি

(৩০ পৃষ্ঠার পর)

বিক্রি করা শুরু করে দেন।

আপনি অ্যামাজন ও ইবের মতো কোনো জনপ্রিয় অনলাইন সেলিং ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করেও এ ধরনের পণ্য বিক্রি করতে পারেন। এই পোর্টালগুলো আপনার পণ্য হোস্টিংয়ের জন্য একটি ছোট ফি কেটে রাখবে। আপনি যখনই কোনো অর্ডার পাবেন, সাথে সাথে আপনার পণ্যটি প্যাকেজ হবে ও সরবরাহ করা হবে। প্রদত্ত অর্ডারসম্পন্ন হওয়ার পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে আপনি আপনার কমিশন পেয়ে যাবেন।

ইউটিউবের জন্য ভিডিও নির্মাণ

অনলাইনে আয়ের হাজার হাজার পদ্ধতির মধ্যে ইউটিউব থেকে আয় একটি জনপ্রিয় উপায়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভিডিও শেয়ারিং সাইট ইউটিউব থেকেও আপনি আয় করতে পারেন। ভিডিও তৈরি করে অনেকেই ইউটিউব থেকে আয় করছেন।

প্রথমে ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও তৈরি করুন। আর আপনার যদি কোনো ভিডিও ক্যামেরা না থাকে, তাহলে আপনি এ ক্ষেত্রে আপনার কমপিউটার ব্যবহার করতে পারেন। আপনাকে অবশ্যই মজাদার/শিক্ষণীয় ভালো মানের ভিডিও তৈরি করতে হবে।

আপনি যদি উন্নতমানের জনপ্রিয় ভিডিও তৈরি করতে পারেন বা আপনার চ্যানেল জনপ্রিয় হয়, তাহলে ইউটিউবের অ্যাডসেন্স পার্টনারশিপ থেকেই একটা অফার পেতে পারেন। ওরা আপনাকে পার্টনার করলে প্রতি মাসে একটা ভালো পরিমাণের টাকা আপনি আয় করতে পারবেন।

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট

প্রযুক্তির এই যুগে একটি ভালো ওয়েবসাইট ছাড়া কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তাই করা যায় না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ওয়েবসাইটটি তৈরির দায়িত্বটি দিয়ে থাকে বিভিন্ন পেশাজীবী ওয়েব ডেভেলপারদের। আর তারা এই ওয়েবসাইটটি তৈরি করেন একটি ভালো অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে। বিভিন্ন দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ ওয়েব ডেভেলপমেন্টকে নিজের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ওয়েব ডেভেলাপারেরা সাধারণত বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে আউটসোর্স হয়।

মনে রাখবেন, বর্তমানে প্রচুর ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডেভেলপার রয়েছেন, যাদের সাথে আপনাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে। তাই নিজের একটি ভালো খ্যাতি অর্জন করতে হবে এবং নিজের একটি যুক্তিসঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

কনটেন্ট রাইটিং

ফ্রিল্যান্স কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজগুলোর অন্যতম একটি কাজ হলো কনটেন্ট রাইটিং। আমরা যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ঢুকি, তখন অনেক সময় বিভিন্ন সুন্দর কথা, কবিতা বা বিবরণ দেখতে পাই। এই কথাগুলো সাধারণত সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ নিজে লেখে না। তারা বিভিন্ন কনটেন্ট রাইটারকে দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এগুলো লিখিয়ে নেয়। যাদের লেখার হাত ভালো ও ব্যাকরণ সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে, তারা খুব সহজেই কনটেন্ট রাইটিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

ডাটা এন্ট্রি

অনলাইন ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য সবচেয়ে সহজ কাজগুলোর একটি হলো ডাটা এন্ট্রি। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ইন্টারনেটে আপলোড করার মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি করা হয়। নতুন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য হতে পারে উপযুক্ত কাজ। এ কাজগুলো করতে কমপিউটার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকলেই চলে। ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতে বর্তমানে প্রচুর ডাটা এন্ট্রির কাজ পাওয়া যায়। তবে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতে ডাটা এন্ট্রির কাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটু বেশি। তবে একটু ধৈর্য ধরলে কাজ পাওয়া যায়। কাজটি সহজ হওয়ায় এতে উপার্জনের পরিমাণ খুব বেশি হয় না। তবে ভালো দিক হচ্ছে, যেকোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ দক্ষতা ছাড়াই এ কাজ করে বেকারত্বের অবসান করতে পারবেন।

অনলাইনে শিক্ষা দেয়া

আপনার যদি ইতোপূর্বে পড়ানোর কোনো অভিজ্ঞতা থেকে থাকে অথবা আপনি যদি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর পারদর্শী হয়ে থাকেন, তবে অনলাইনে বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর মাধ্যমেও আয় করতে পারেন। প্রথমে বিভিন্ন অনলাইন শিক্ষাদান বিষয়ক প্লাটফর্মগুলোতে সাইনআপ করুন। এরপর আপনি যে বিষয়গুলো শেখাতে চান, তার একটি তালিকা তৈরি করে সেখানে আপনার একটি প্রোফাইল তৈরি করুন। আপনার কী অভিজ্ঞতা আছে, আপনার যোগ্যতা কী ইত্যাদি এই প্রোফাইলে তুলে ধরুন। এ ছাড়া উদ্যোমির মতো পোর্টালগুলোকে বানিয়ে ফেলতে পারেন আপনার নিজস্ব ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ।

সূত্র : গেজেটসনাউ